স্বাধীনতার ৭৫ বছর, দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য

(SWADHINOTAR POCHATTOR BOCHHOR ,DESHBHAG O BANGLA SAHITYA.)

ড. অন্তরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়,
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

KEYWORDS:-

জনগণের মানসিক দুর্বলতা, শোষণের চিন্তাধারা, রাজনৈতিক চক্রান্ত ও অসহিষ্ণুতা, সুগভীর ষড়যন্ত্র, বিভেদ নীতি, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ফলাফল ।

ABSTRACT :-

স্বাধীনতা মানুষের স্বাভাবিক স্পৃহা। পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত স্বাধীনতার জন্য দেশভাগ একটি দুঃখজনক ঘটনা। যদি তা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লাভ করা হয়, তবে তা যেমন বর্ণনাবহুল তেমনই মর্মস্পর্শী। ভারতের স্বাধীনতালাভ ও দেশভাগ তেমনি একটি বিষয় যা আগে কখনো ঘটেনি। একটি দেশ যা দুশো বছরের বেশি পরাধীন ছিল, স্বাধীনতাপিপাসু জনগণের বিভিন্ন ধরণের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সেই বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ঘটেছে, তবে তা ঘটেছে দেশভাগের মধ্য দিয়েই। হাজার হাজার স্বদেশী ও সংগ্রামী মানুষ কখনো অহিংস কখনো বা সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা লাভ করে। তবে এই স্বাধীনতার জন্য ভারতের দুটি প্রদেশকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে, যা শহীদদের আত্মবলিদান অপেক্ষা কম গৌরবজনক নয়।

ভারতের এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল। ১৭৫৭ এ সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় বাংলায় ইংরেজরাজত্বের সূত্রপাত করেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ও তার ব্যর্থতায় ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতবর্ষ জয়ের গৌরব লাভ করে ও ভারতবর্ষ মহারানীর ভিক্টোরিয়া রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। দুঃখের বিষয় ইংরেজশাসনে জনগণ আংশিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করলেও পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বিজয়ী ও বিজিত মনোভাব উভয়ের মধ্যে সুপ্তভাবে বিরাজমান ছিল। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত গড়ে উঠেছিল সামরিক শক্তি ও কূটনৈতিক ছলনার উপর নির্ভর করে। এই কারণে এই সাম্রাজ্যের ভিত দৃঢ় হতে পারেনি। আবার দেশীয় রাজারা প্রথমদিকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও 'অধীনতামূলক মিত্রতার' মাধ্যমে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কিছু পরিমাণে বজায় রাখতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে কিছু সংখ্যক বাঙালি পাশ্চাত্য দেশীয় দর্শন সাহিত্য ও রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এর ফলে পাশ্চাত্য দেশের মানুষ জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল সে খবর তাদের অজানা ছিল না। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফরাসি দেশের বিপ্লব, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি ও ইতালির গণআন্দোলন তাদের মনে নতুন প্রেরণার জন্ম দিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতার উদ্যোগ পর্ব বলে মনে করা হয়। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গণ-আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসক কে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়, কিন্তু চতুর ইংরেজ ভারতীয় নাগরিকদের দুটি সম্প্রদায়িক দল বা হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত করে ভারতবর্ষকে ভারত ও পাকিস্তান দুটি দেশে বিভক্ত করে দেয়। এই দাঙ্গা, লুঠতরাজ ও মহিলাদের সম্মানহানি-এসবই এই স্বাধীনতার মূল্যে দিতে হয়েছে। পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বাংলার মানুষ অশেষ লাঞ্ছনার পর ভারত রাষ্ট্রে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ও দেশভাগের বাতাবরণে সাহিত্যও, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য তার প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। এসব রচনাগুলি সমকালীন যুগের প্রতিচ্ছবি যা অনেক ক্ষেত্রেই মর্মান্তিক। তাই দেশভাগ বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ দিকচিহ্ন নির্ণয় করেছে।

মূল প্রবন্ধ

এই প্রবন্ধটি বা আলোচনাটি আরম্ভ করবার পূর্বে স্বাধীনতা, দেশভাগ নিয়ে সঠিক আলোচনা করা বিশেষ জরুরি বলে মনে হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও তার বিষফলস্বরূপ দেশভাগ ভারতবর্ষকে শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দই দেয়নি, দেশভাগ নামক ভয়াবহ এক সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। এই দেশভাগের ফলে অসহায় কোটি কোটি মানুষ নিজেদের আশ্রয় বা বাসস্থান ত্যাগ করে ছিন্নমূল পরিবারে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে পাঞ্জাব ও বাংলার মানুষকে অপরিসীম দুর্গতির শিকার হতে হয়েছিল। এই বিভাজন শুধু ধর্মভিত্তিক হয়নি, এর পশ্চাতে সুচতুর রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা দখলের নিপুণ ষড়যন্ত্রও ছিল। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল- ১) পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া দুটি অংশ পাকিস্তান নামে গঠিত হলো, পশ্চিম অংশের নাম পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব অংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান। এই পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানেরই অংশ যা মুসলিম অধ্যুষিত। ২) ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশও স্বাধীন হলো। সংবিধানে তার নাম হলো ভারত বা ইন্ডিয়া।[১] এই ভারত বা ইন্ডিয়া হল একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এখানে সমস্ত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হল। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান একই রাষ্ট্রযন্ত্রের বা শাসকের অধীনে থাকলেও পারস্পরিক পার্থক্য থাকায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এক বিক্ষুব্ধ গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীন "বাংলাদেশ" নামে জন্ম লাভ করে। পরাধীন ভারতবর্ষের যে পাঁচশর বেশি ছোট বড় স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল তাদেরও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার দেওয়া হলো। পরবর্তীকালে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য ব্রিটিশ মানচিত্রে পৃথক রাষ্ট্র হওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে ব্রহ্মদেশ বা বার্মা অথবা মায়ানমার পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই অখণ্ড ভারতবর্ষ কোনদিনই একটি সমগ্র রাষ্ট্ররূপে, পরিগণিত হয়নি। ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শাসক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। প্রথমে আর্যাবর্তের বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যরূপে, পরে আলেকজান্ডার প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণে খন্ড খন্ড রাজ্যে পরিণত হয়েছিল । এই শাসকবর্গ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত ছিল। তাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো একতা বা সৌহার্দ্য বজায় ছিল না। তাই বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করবার মতো মানসিক ও যুদ্ধবিশারদ শক্তি তাঁদের

মধ্যে ছিল না। বিদেশীরা এই অনৈক্যের সুযোগে সহজেই চিরশ্যামলা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই দেশকে আক্রমণ ও অধিকার করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল। বিজয়ী আলেকজান্ডার নিজের দেশে ফিরে গেলেও (যদিও পথমধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে) বিদেশী আক্রমণে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনোবলে তীক্ষ্ণ আঘাত লাগে। পরে বিভিন্ন বাদশাহ ভারতবর্ষে রাজত্ব করে। তারা ভারতবর্ষকে বিজিত রাষ্ট্র বলে মনে করলেও কালক্রমে এখানেই সাম্রাজ্য স্থাপন করে ও দীর্ঘদিন রাজত্বের নজির সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজরাই দিল্লির বাদশাকে পরাজিত করে ভারতবর্ষকে জয় করে ও খন্ড খন্ড রাজ্যগুলিকে ভারতবর্ষ নামক একটি সংঘটিত রাষ্ট্রের বন্ধনে আবদ্ধ করে। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দুশবছর অতিক্রান্ত হবার পর ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্যুত হওয়া কয়েকটি ভূখণ্ডকে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে দেশবিভাগের পরিণাম বলেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তার কারণ এই দেশভাগ প্রশাসনিক বা ভৌগোলিক কারণে গঠিত হয়নি, বস্তুতঃ এই দেশভাগ ভারতের জনগণের মানসিক দুর্বলতা, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের সুগভীর ষড়যন্ত্র, বিভেদ নীতি, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, শোষণের চিন্তাধারা, রাজনৈতিক চক্রান্ত ও অসহিষ্ণুতার বাতাবরণে সংঘটিত। কিছু অশিক্ষিত মৌলবাদী সংগঠন মানুষের মূঢ় চেতনাকে সম্বল করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত মনোবিকারে লিপ্ত হয় যা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পুণ্য সন্ধিক্ষণে দেশভাগকে অবশ্যম্ভাবী ও বাস্তবিক করে তুলেছিল। তার কতটা যথার্থ আর কতটাই বা স্বার্থান্বেষী মানুষের মদতপুষ্ট তা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। তবে একথা ধ্রুবসত্য যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেশভাগের মূল্যেই অর্জিত হয়েছিল। এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার পশ্চাতে যেমন শত শত স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের আত্মোৎসর্গের গৌরবময় কাহিনী আছে, তেমনই রয়েছে রক্ত কলূষিত দাঙ্গার ঘটনা, শত শত নারীর সম্মান, সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। অগ্নিসংযোগ, সাম্প্রদায়িক হত্যালীলা, লুঠতরাজ ধর্ষিতা নারীদের বিলাপ, মা-বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষা করার লড়াইয়ে পিতা-মাতা ভ্রাতাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সবশেষে কন্টকিত দেশভাগ স্বীকার করে নেওয়া। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক নেতাদের অপরিণামদর্শিতা, অন্যায় জেদ ও অবিমিষ্যকারিতার ফলাফল হল এই দেশভাগ। দেশবিভাগের দাবিকেও সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বা অযৌক্তিক বলা যায় না, কারণ দুই যুযুধান শক্তি কখনোই পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সৌহার্দ্যের কল্পনা করতে পারে না। দেশভাগের পরিকল্পনা না

থাকলেও ইংরেজ সাম্প্রদায়িক বিভেদনীতি প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে এর প্রস্তুতিপর্ব তৈরি করেছিল। সেই বিষবাঁশীর সুর ও তালের ছন্দে ধ্বংসের দামামা বেজে উঠেছিল। এই দেশভাগের ফলে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়, পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজনৈতিক স্বার্থে এই বিভাজন সুপরিকল্পিত ও শাসনক্ষমতা দখলের জন্যই এই বিভেদের সৃষ্টি। আর এই দেশভাগের ফলেই পূর্ববাংলা থেকে আগত কোটি কোটি বিপর্যস্ত মানুষ নিজেদের জন্মভূমি বা জন্মভিটে ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অবশ্য দেশভাগে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের অভিজ্ঞতাও আছে। তবে এই দেশভাগ কেন এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে কিছু কথা বলা অবশ্যক । ভারতবর্ষ কেন দু'শো বছর ইংরেজ শাসনের অধীন ছিল তাও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজের সঙ্গে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধের পরেই ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তাচলে গিয়েছিল। মীরজাফরের ষড়যন্ত্রে জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, ঘসেটি বেগম, শওকত জং প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকরা ইংরেজের সঙ্গে যোগসাজশ করে সিরাজদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও হত্যা করে। এই যুদ্ধ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ইংরেজ বাহিনীকে প্রভুত্বের পথ সুগম করে দিয়েছিল। তারপর ধাপে ধাপে ইংরেজ শক্তি দেখা দিল ভারতের রাজশক্তিরূপে। এর মূলে ছিল বহু যুদ্ধ, ছলনা, ষড়যন্ত্র আর দুর্নিবার লোভের সমাবেশ। শুধু বাংলায় নয়, পলাশীতে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থাৎ ইংরেজদের প্রভাব বিস্তার লাভ করল। বণিকের মানদন্ড যে কটি স্তর অতিক্রম করে রাজদণ্ডরূপে রূপান্তরিত হয়, তারই প্রথম স্তর রচিত হয়েছিল পলাশী প্রান্তরে। এই কারণে পলাশীর যুদ্ধকে ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের সূচনা রূপে চিহ্নিত করা হয়।[২]

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরকে ইংরেজরা বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত করলেও ছলে-বলে-কৌশলে রাজকোষ থেকে প্রচুর নগদ অর্থ উপঢৌকন হিসেবে লাভ করে। এরপর তাদের লক্ষ্য ছিল নবাবের পতন বা পরিবর্তন। এক্ষেত্রে তাদের মনোনীত ব্যক্তিটি হলো মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম আলী।

মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজদের সহায়তায় নতুন নবাব হলেন মীরকাশিম (অক্টোবর ১৭৬০)। মীর কাশেম ইংরেজদের সহায়তা পেয়ে নবাব হয়েছিলেন সত্য কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন। স্বাধীনচেতা মীরকাশিম তার রাজধানী বিহারের মুঙ্গেরে নিয়ে গেলেন। তাছাড়া ইংরেজরা শুল্ক বাণিজ্যের যে অধিকার ভোগ করতো তা নতুন নবাব বন্ধ করে দিলেন। এজন্য তার সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস নবাবকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করল। ১৭৬৪ বক্সারের যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে মীর কাসিম পলায়ন করেন ও কয়েক বছর পরে তার মৃত্যু হয়। বক্সারের যুদ্ধের এক বছরের মধ্যেই ইংরেজরা বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী তথা রাজস্ব সংগ্রহ ও দেওয়ানী বিচারের অধিকার লাভ করেছিল। এই সময় থেকেই লর্ড ক্লাইভের পদোন্নতি হয়। বুদ্ধিমান ইংরেজ শাসনকর্তা লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বের ফলেই ইংরেজরা শাসনকার্যে প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজ শক্তির প্রভুত্ব স্থাপনের পথ যেভাবে তিনি রচনা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তির তিনি প্রকৃত রচয়িতা। কেবল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নয়, ব্রিটিশ শক্তি ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্য অঞ্চল গুলিতেও আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। মহীশূর, মারাঠা, শিখ ও অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তার করে। ছলে, বলে, কৌশলে ভারতে ইংরেজ বা ব্রিটিশদের সার্বভৌম শক্তির বিস্তারই ছিল তাদের লক্ষ্য। লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড ডালহৌসী প্রভৃতি ইংরেজ শাসকদের আমলে এই শক্তি সর্বাধিক সাফল্য লাভ করে। লর্ড ডালহৌসির আমলেই এই ইংরেজ সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। তাঁর শাসনকালে ভারতবর্ষের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ছিল ইংরেজদের দখলে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ ছিল দেশীয় রাজাদের অধীনে। কিন্তু ডালহৌসির কার্যকাল শেষ হবার কিছুকালের মধ্যেই এমন ঘটনা ঘটলো যে তার ফলে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠেছিল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই আঘাত এসেছিল পলাশী যুদ্ধের ঠিক ১০০ বছর পরে। ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাটিকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে শুধু সিপাহীরাই নন, আপামর জনসাধারণরাও যোগ দিয়েছিল। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ এর "মেরে ঝাঁসি

নেহি দুঙ্গা"-র প্রতিধ্বনি করে উঠল ভারতবর্ষ এর সাধারণ জনতা "মেরে ভারত নেহি দুঙ্গা"। সমস্ত নাগরিকদের ভয়ভীতি জড়তা কেটে গেল।[৩]

এই সময়কার কবি ও সাহিত্যিকরাও নীরব ছিলেননা। কবি-লেখকদের হৃদয়ও স্বদেশপ্রেমের বন্যায় আলোড়িত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের রচনায় এই স্বদেশপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। তাঁদের আখ্যান কাব্যগুলিতে স্বদেশপ্রেমকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পরিস্ফুট করা হয়েছে। রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান" ক্ষত্রিয়দের প্রতি রানা ভীম সিংহের উৎসাহ বাণী প্রায় সকলেরই কণ্ঠস্থ।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায়, কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায়।।

কবিতাটি জনগণের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছিল।

মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেও তাঁর স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাধীনতা-স্পৃহার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যও মূলত স্বদেশী ভাবনায় বিরচিত। বৃত্রাসুরের হাতে পরাজিত দেবতাদের পুনরায় স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের কাহিনীই "বৃত্রসংহার" এর উপজীব্য । এই কাব্যে কার্তিকের উক্তির মাধ্যমে কবির স্বদেশপ্রীতির প্রতিফলন ঘটেছে। নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের মধ্যেও কবির স্বদেশ প্রীতির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে দেখা গিয়েছে। কেবলমাত্র কাব্য নয়, সমসাময়িক যুগের উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলির মধ্যেও দেশাত্মবোধের

প্রকাশ ঘটেছে। সমকালীন আন্দোলনের প্রেরণাতেই এগুলি রচিত হয়েছে । সে যুগের ঔপন্যাসিক বলতে সাধারণতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কথাই মনে পড়ে। তাঁর "আনন্দমঠ" উপন্যাসের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রতিধ্বনি শোনা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের "বন্দে মাতরম" মন্ত্র তাঁরই লেখনীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই "বন্দে মাতরম" মন্ত্রে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। শত শত স্বাধীনতা যোদ্ধা এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে কাল্পনিক গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠে" দেশাত্মবোধের মহাকাব্য রচনা করেন। মুঘল যুগের সমাপ্তি ও ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এর কাহিনী বিস্তৃত। বাইরের মুসলমান বিরোধিতা থাকলেও আসলে ইংরেজ কুশাসনের বিরুদ্ধেই প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতাস্পৃহার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি উদ্দীপনা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য, নাটক সর্বত্রই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ তথা স্বদেশপ্রেম বা স্বাধীনতার সুর অনুরণিত হয়ে উঠেছিল । ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় জাগৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। এই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়, আবার এই বছরেই "ন্যাশনাল থিয়েটার" স্থাপিত হয়। একদিকে জ্ঞানের বিচার অন্যদিকে রসের প্রকাশ-এই দুদিকেই জাতীয় আন্দোলন কল্লোলিত হয়ে ওঠে। নাটকের মর্ম মূলেও প্রতিধ্বনিত হয় জাতীয়তার মন্ত্র, আর নাট্যক্ষেত্রে একক প্রযোজক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকের প্রবর্তক।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পট ভূমিকায় সমগ্র বাংলাদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারেরা তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। সমসাময়িক স্বাদেশিক চেতনার চিহ্ন সে সময়ের নাটকে আছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের ‘সিরাজদ্দৌলা’ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘নন্দকুমার’ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘প্রতাপসিংহ’, ‘দুর্গাদাস’, ‘মেবার পতন’ এই শ্রেণীর নাটকগুলিতে নাট্যকারদের সুগভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার

জন্য আত্মত্যাগের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। পরাধীন জাতির মুক্তির আকুলতার কাহিনী আমাদের নিজেদের কাহিনী হয়ে উঠেছে।

১৮৯১ সাল থেকেই ইংরেজ সরকার বাংলাকে দুটি শাসনবিভাগে বিভক্ত করে হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে আরও বাড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালায়। ভারতীয় শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করাই ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য। ১৯০৫ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলাকে দ্বিধা বিভক্ত করার চেষ্টা করলেন। বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে শুরু হল। দেশের পরাধীনতায় হীনমন্য নাগরিকগণ, শিল্পী, কবি, নাট্যকার সকলেই এই বাংলা ভাগের প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। ইংরেজদের এই দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করলেন। যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য বাঙালি সেদিন প্রস্তুত ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে লেখনীকে মাধ্যম করলেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হোক্ পুণ্য হোক্ পুণ্য হোক্
হে ভগবান।

লর্ড কার্জনের এই বঙ্গভঙ্গ অবশ্য সেবার কার্যকর করা যায়নি। অবশ্য বাংলাকে ভাগ করার পরিকল্পনা প্রথমে তার মাথায় আসেনি। এটিকে কার্যকর করার কয়েকদিন আগে ঢাকার নবাবের বাড়িতে মুসলমান নেতাদের তিনি বলেছিলেন "আমি আপনাদের একটি মুসলিম প্রদেশ দিচ্ছি"।[৪] তীব্র আন্দোলনের চাপে ইংরেজ সরকার সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়। এভাবে পৃথক প্রদেশ বাতিল হয়ে যাওয়ার পর বেশকিছু মুসলমান নেতা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ঘটনায় তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। তাদের অসন্তোষকে অবলম্বন করে সরকার অন্য রণকৌশলের আশ্রয় নেয়। ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন চলেছিল। মহারাষ্ট্র ও বাংলায় ইংরেজ সরকারের এই বর্বর সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠন গড়ে উঠল ও একইসঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনও চলতে থাকলো। ১৮৮৫ সালে গঠিত ভারতীয় কংগ্রেসের স্থবির আদর্শের বিরোধিতা করে বিভিন্ন স্থানে সহিংস আন্দোলন শুরু হল। লোকমান্য তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ সকলেই এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। "অনুশীলন সমিতি", 'যুগান্তর দল' ইংরেজ নিধনের জন্য গোপনে যুবশক্তিকে প্রস্তুত করতে লাগলো। ইংরেজ সরকারও এই আন্দোলন দমন করবার জন্য প্রভূত চেষ্টা করতে লাগেন।[৫] কিন্তু স্বদেশী যুবকরা তখন "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" করে দেশের ডাকে অগ্রসর হলেন। এরই মধ্যে ১৯০৬ এ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, হিন্দু মহাসভার জন্ম, ১৯০৮ এ প্রথম ভারতীয় শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসি, ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ১৯১২ তে জালিয়ান ওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, রবীন্দ্রনাথের "নাইট উপাধি" ত্যাগ, রাওলাট আইনের প্রবর্তন ভারতীয় জনমানসে ব্রিটিশ তথা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সূচনা করে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটলে তখন মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনায় প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ব-শাসনভার দেওয়া হলেও অর্থনৈতিক কারণে ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের কোন দায়িত্ব থাকলো না। পরিবর্তে আয়ের একাংশ ভারত সরকারকে রাজস্ব দিতে বাধ্য করা হলো। যুদ্ধ-জর্জরিত সাধারণ নাগরিকের ওপর এই অবিচার বাংলার বুকে জগদ্দল পাথরের মত ভারী হয়ে উঠল। ১৯১৭ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ ডান্ডি অভিযান, সাইমন কমিশনের নিয়োগে দেশব্যাপী প্রতিবাদ হরতাল ভারতবাসীর মনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন প্রস্ফুটিত করল। ১৯৩০ এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, ১৯২৫ এ দেশবন্ধু চিত্ররঞ্জন দাশের মৃত্যু, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, লবণ সত্যাগ্রহ, ডান্ডি অভিযান, প্রভৃতি অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, ১৯২৯ এ লাহোরের কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ১৯৩৫ এ ভারত শাসন আইন ভারতীয়দের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ বর্ধিত করল। ১৯৩০ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ১৯৪১ এ সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান, ১৯৪৩ এ বিদেশে তাঁর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ

সরকারের প্রতিষ্ঠা ও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, ১৯৪৪ এ ভারত ভূখণ্ডে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন স্বাধীনতার পথে ভারতকে কয়েক ধাপ উত্তীর্ণ করে।[৬]

"১৯৪৩ সালের ২৫ আগস্ট তিনি (সুভাষচন্দ্র বসু) আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহশালার অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। সেদিন তিনি আনন্দের সঙ্গে বলেন— 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য আমি ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলাম।'স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সৈনিক হওয়ার চাইতে বড় সম্মান ও গৌরবের অন্য কিছু নাই। আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সেবক হিসাবেই আমি নিজেকে গণ্য করি। আমি আমার কর্তব্য এমনভাবেই সম্পাদন করব যার দ্বারা প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন। আমার কর্তব্য বড় কঠিন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের উপর আমার গভীর আস্থা আছে। আটত্রিশ কোটি ভারতবাসী অর্থাৎ পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ জাতির স্বাধীন হবার পূর্ণ অধিকার আছে। আর আজ তারা সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবকিছু মূল্য দিতে প্রস্তুত। কাজেই আমাদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার কোনও শক্তি পৃথিবীতে নাই। সহকর্মীগণ, আমাদের কাজ শুরু হয়েছে, 'চলো দিল্লী' ধ্বনিসহকারে চলো আমরা এগিয়ে যাই।[৭]

এই স্বাধীনতালাভের জন্যই প্রাণপাত পরিশ্রম, দুর্ভোগ, কষ্টস্বীকার ও দেশত্যাগ, তবে আশ্চর্যের বিষয় এই সাম্প্রদায়িক দেশভাগ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও হিন্দু মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা বিভিন্ন নেতা অর্থাৎ গান্ধীজি, জহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ. মহম্মদ ইকবাল, মহম্মদ জিন্নাহ পেশ করেছিলেন তার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার কোন প্রস্তাব ছিল না। মুসলিম লীগ তার জন্য কোন পৃথক কর্মসূচিও গ্রহণ করেনি। একমাত্র কংগ্রেসই এই কাজে সক্রিয় ছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি থেকে কংগ্রেসের পদত্যাগই এর কারণ। মুসলিম লীগ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িকতার শিখরে

আরোহন করে জিন্না কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দেন ও ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের করাচি অধিবেশনে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইংরেজ সরকারের কাছে এক ভয়াবহ অভিশাপ রূপে দেখা দিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা, আণবিক শক্তির পরিনাম, বিশ্বব্যাপী ধিক্কার, অর্থনৈতিক চাপ ইংরেজ সরকারের কাছে সাম্রাজ্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। ১৯৪২ র 'ভারত ছাড়' বা 'কুইট ইন্ডিয়া' আগস্ট বিপ্লব, বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনগুলির বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর কাছে সমস্যা বহুল হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তির মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি বরং "ভাগ করো আর শাসন করো"নীতি অনুসরণ করে তারা লাভবান হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই সাম্রাজ্য যে তাদের ছেড়ে চলে যেতে হবে তারা ভালো করেই বুঝে গিয়েছিল। তাই তাদের দমননীতিও বহাল থাকলো। সঙ্গে থাকলো সংগ্রামী মানুষের স্বাধীনতার লড়াই। বড় বড় নেতারা কারারুদ্ধ হলেন কিন্তু গণআন্দোলন চলল। বিদেশী দ্রব্যবর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনই ছিল জনগণের প্রধান অস্ত্র। স্বাধীনতার লড়াইয়ে মুসলিমরা একযোগে লড়াই করলেও পরবর্তীতে মুসলমানদের একাংশও এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা নীতিতে বিশ্বাসী হন। তারই পরিনাম হিসেবে শুরু হয় দাঙ্গা। পাঞ্জাব বাংলায় এই দাঙ্গা এতই ভয়াবহ হয় যে গান্ধীজিকেও বাংলার কলকাতা ও পূর্ব বাংলার নোয়াখালী জেলায় দীর্ঘদিন অবস্থান করতে হয়। জিন্নার বিশ্বাস ছিল ইংরেজরা ক্ষমতার হস্তান্তর করতে রাজি কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগে তারা পাকিস্তান সৃষ্টি করতে দিচ্ছে না— এই মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভাবী রূপরেখাও তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। এই দাঙ্গা শুরুর তারিখটি নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৬ ই আগস্ট ১৯৪৬ যা ইতিহাসে "দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" নামে পরিচিত। প্রস্তাবিত যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু কার্যত তা হয়েছিল হিন্দুদের সঙ্গে। বাংলায় তখন মুসলিম লীগের মন্ত্রিসভা। তখন সুরাবর্দি মুখ্যমন্ত্রী । তিনি দিনটিকে ছুটির দিন ঘোষণা করেন। মুসলিম লীগ তার অনুগতদের উদ্দেশ্যে একটি স্লোগান দিয়েছিল— "লেকর রহেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। মুসলিম লীগ ও সুরাবর্দির প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় কলকাতায় চার দিন ধরে হিন্দুদের উপর

অকথ্য অত্যাচার, লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও হত্যা করা হয়েছিল। এই নারকীয় দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা নির্ধারণ করা না গেলেও প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তি নিহত ও পঞ্চাশ হাজার লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল। বহু হিন্দু বাড়ী অগ্নিদগ্ধ, লুটপাট ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছিল।

এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এলাকা শুধু কলকাতা বা বাংলা নয়। তা ছিল ভারতব্যাপী। পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটেছিল। পাকিস্তান গঠন নিয়ে সুরাবর্দির মনোভাব কি তা নিয়ে জিন্নার মনে সংশয় ছিল। কিন্তু নির্দয় সুরাবর্দির কাছে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল। বাংলার মুসলমানদের উপর তার প্রভাব ও পাকিস্তানের প্রতি তার সমর্থন বা আগ্রহ দেখাতে তিনি এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন।[৮]

সেই সময়কার ভাইসরয় ওয়াভেল কলকাতার দাঙ্গা সরজমিনে দেখার পর গান্ধীজি ও নেহরুর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন কিন্তু ততদিনে নতুন ভাইসরয় রূপে মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষের ভাইসরয় নির্বাচিত হন। মাউন্টব্যাটেন ছিলেন নৌ বাহিনীর মানুষ ও একই সঙ্গে রাজ পরিবারের সদস্য। তাই এই কাজে তিনি যোগ্যতম ব্যাক্তি। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি নিয়ে ভারতবর্ষে যে ঘটনাপ্রবাহ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছিল মাউন্টব্যাটেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। যে ভারতবর্ষ তাঁর সম্পূর্ণ অজানা তাকেই তিনি স্বাধীনতা দেবেন। ভারতে আসার আগে তিনি আই.সি.এস ভিপি মেননের একটি নোট দ্যাখেন ও ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ এর সঙ্গে দেখাও করেন। মাউন্টব্যাটেন তার পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাংলা ও পাঞ্জাবের গভর্নররা দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন, কেননা তারা বাংলা ও পাঞ্জাবের ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন যে কাজের জন্য এসেছিলেন তা সুসম্পন্ন হল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হলো। সেই দিনের অবসানে ১৫ই আগস্ট মধ্য রাত্রিতে খন্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। নতুন রাষ্ট্রের নাম হল ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত।

দেশভাগ হল কিন্তু দুটি সম্প্রদায়ের দেশত্যাগ ও সীমানা নির্ধারণ কিভাবে হবে? সেজন্য দেশবিভাগের পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান স্যার রেডক্লিফ হলেও, তাঁকে সহায়তা করার জন্য আই.সি.এস ভি.পি মেননকেও অন্তর্ভুক্ত করা হলো। মাত্র ৩৬ দিন রেডক্লিফ ভারতবর্ষ নামক দেশটির ব্যবচ্ছেদ করার জন্য সময় পেয়েছিলেন।

দেশভাগের ফলে রাজনৈতিক পরিবেশ কলূষিত হয়ে পড়ল। পূর্ববঙ্গ থেকে ও পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে লাখ লাখ মানুষ যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গে ও পূর্ব পাঞ্জাবে আসতে বাধ্য হল। ভারত সরকারের দৃষ্টিতে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু বা বাস্তুত্যাগী জনগণ ছিলেন সুয়োরানী আর বাংলার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু হলো দুয়োরাণী। আসলে নতুন ভারত সরকার প্রথমে স্বীকার করেননি যে পূর্ব পাকিস্তানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যার পরিণামে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সেইসব হতভাগ্য বাস্তুহারাদের সরকার উদ্বাস্তু বলে মনে করেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য উদ্বাস্তু ট্রেনে করে শিয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছালে দেখা দেয় চরম দুর্দশা। উদবাস্তুদের জন্য সরকার প্রথমে বিভিন্ন স্টেশন ও পরিত্যক্ত গুদাম ঘরে অস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে। পরে বিভিন্ন শিবির বা ক্যাম্প তৈরি করে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।[৯] পরিসংখ্যান বলছে, দেশভাগ পরবর্তী প্রায় আড়াই দশকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ঘর গৃহস্থালী ত্যাগ করে শুধু প্রাণে বাঁচবার জন্য ৫২ লক্ষ ৮৩ হাজার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এই সময় স্রোতের মতো আছড়ে পড়া শরণার্থীদের অধিকাংশের গন্তব্য ছিল কলকাতা ও তার সংলগ্ন জেলাগুলি, উত্তর ২৪ পরগণা. নদীয়া, দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার। এই অবিরাম উদ্বাস্তুস্রোত

প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা সরকারের ছিল না। ক্ষমতালোভী শাসকরা বোঝেননি যে দেশভাগের পরিণাম কি নির্মম হতে পারে! হাজার হাজার হিন্দু মহিলা মুসলমানদের দ্বারা ধর্ষিতা হলেন, তাই সরকার নিত্য নতুন ফরমান জারি করে উদ্বাস্তুদের "ডোল" বন্ধ করে দিল। ১৯৪৯ এর ৩রা ফেব্রুয়ারি সাংবিধানিক সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টই বললেন- সরকারি নীতি হলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা ব্যক্তিদের ফিরে যেতে উৎসাহিত করা। অথচ তা যে সম্ভব নয় তা তৎকালীন পুনর্বাসন মন্ত্রী মোহনলাল সাক্সেনার কথায় স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।[১০] পঞ্চাশের দশক জুড়ে সরকারি উদ্যোগে প্রায় ৩৮৯ টি রিফিউজি ক্যাম্প গড়ে তোলা হয় তবে সেগুলি কোনটাই কলকাতায় নয়, উদ্বাস্তুদের সেই ক্যাম্পে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এর প্রতিবাদে উদ্বাস্তরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করেন। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের এক বিকেলে সেই প্রতিরোধেই গুলি চালায় পুলিশ। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরেই নয় জনের মৃত্যু হয়। ১৯৫০ সালের ২১ মে ধুবুলিয়া ক্যাম্পের বিক্ষোভকারী মহিলারা ট্রেন অবরোধ করেন।[১১] ১৯৫০ এর স্থাপিত হয় ইউনাইটেড সেন্ট্রাল রিফিউজি কাউন্সিল যার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহিলা।

পুনর্বাসনের প্রশ্নে সরকারের অনীহা ও গাফিলতির জন্য উদ্বাস্তুরা নিজেদের হাতেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ফাঁকা জমি দখল করে নিতে বাধ্য হল। লেক মিলিটারি ব্যারাক, যোধপুর পার্ক, শাহাপুর, বালিগঞ্জ, ধর্মতলার মিলিটারি ব্যারাক, দুর্গাপুর রোড, বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, দমদম, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, বারাসাত প্রভৃতি জায়গার পতিত, নিষ্কর জমিগুলি তারা দখল করে নিল। এই কাজে মহিলাদের সঙ্গে নেতৃত্ব দেন স্বাধীনতাসংগ্রামী সন্তোষ দত্ত, দীনেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত প্রভৃতি দরদী ব্যক্তিত্বরা। ১৯৫০ এর মধ্যে গড়ে ওঠে ১৪৯ টি কলোনী, যাতে মাথা গোজার ঠাঁই হয় ২৯,৮৫৫টি পরিবারের ১,৪৯,২৮০ জন উদ্বাস্তুর। এরপর শুরু হয় জীবনের আর একরকম সংগ্রাম যা জীবনকে মহত্তর পথে উন্নীত করে। আর যারা দণ্ডকারণ্য বা অন্যান্য স্থানে অভিগমন করে তাদের কথা বর্তমানকাল মনে রাখেনি।[১২]

এই-ই হোল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ও দেশভাগের ইতিহাস। স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে যে জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যও তার থেকে মুক্ত ছিল না। পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর আগমনে পশ্চিমবঙ্গের যে অসম অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল সাহিত্যের মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের সাহিত্যধারার থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে এই সময়কাল ও আধুনিক সময়ের পূনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত জরুরী।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের যে খসড়া নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে সেই খসড়া বাস্তবিক সীমানা নির্ধারণ করল, পরে দুই বাংলার আন্তর্জাতিক সীমা বলেই চিহ্নিত করা হলো।[১৩] বলা যেতে পারে, এই দেশভাগ বাংলা ও পাঞ্জাবের মধ্যেই অধিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। আমাদের আলোচনা বাংলা ভাগ ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অবশ্য গল্প, কবিতা, নাটক, সিনেমাও তার অন্তর্ভুক্ত হবে।

এবার বাংলা সাহিত্যের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। প্রবোধকুমার সান্যাল এর "হাসুবানু"[১৪] উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের এক বর্ধিষ্ণু জমিদারকন্যা মীরা কলকাতায় এসে আড়াইশো টাকার চাকরি গ্রহণ করেছে। উদ্বাস্তু মেয়েদের চাকরি করা ও স্বনির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের কাছে বিসদৃশ মনে হলেও ক্রমশঃ তাদের সৎপ্রচেষ্টা অচিরেই প্রতিষ্ঠা পেল। বাংলা সাহিত্যে দেশভাগের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলে অবশ্যই "হাসুবানু" উপন্যাসটির কথা মনে করতে হবে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে হাসুবানু অন্যতম। আদতে উত্তর কলকাতা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা প্রবোধকুমার সান্যাল এবঙ্গের ভূমিপুত্র হিসেবে দেশভাগ তথা বাংলা ভাগ ও এর পেছনের কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন কখনও হাসুবানু, কখনও মীরা ও কখনো হিরণের বক্তব্যের মাধ্যমে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বোধ ও সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'হাসুবানু' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান সুরটি হলো সামাজিক ও অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অবশ্য সেই প্রতিবাদ কতখানি নিজ অভিজ্ঞতার ফসল বা কতখানি কল্পনাপ্রসূত তা সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। হাজীপুরের জমিদার জীবেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত প্রজাবৎসল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর একমাত্র কন্যা মীরার বিয়েটা বানচাল হয়ে গেল। কন্যাসম্প্রদানের ঠিক আগেই মুসলিম প্রজাদের একটি দাঙ্গাবাজ গোষ্ঠী বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কন্যাসম্প্রদান করা যায়নি কারণ উভয়পক্ষের পুরোহিতরা ও আত্মীয়-স্বজনরা প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন। সমস্ত ব্যাপারটা লন্ডভন্ড হয়ে গেল। উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স এখান থেকেই শুরু হল। ধনসম্পদ-সহায়-সম্বলহীন হয়ে কলকাতায় এসে বেনীমাধব মল্লিক বা বেনু মল্লিকের আশ্রিত হয়েছিল জীবেন্দ্রনারায়ণ স্বয়ং ও তাঁর পরিবার।[১৫] জীবেন্দ্রনারায়ণ কলকাতার একটি প্রেসে সামান্য বেতনভুক্ত কর্মীর চাকরি নিলেন। জীবেন্দ্রনারায়নের ছোট ভাই রমেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী সুমিত্রা দেবী ও তার ননদ মীরার চারিত্রিক পদস্খলন উপন্যাসের একটি বিশেষ সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যায়। বেণী মল্লিকের সঙ্গে সুমিত্রা দেবীর ঘনিষ্ঠতা, সুমিত্রা দেবীর হাজীপুরে যাওয়া, তার একমাত্র সন্তান অত্রির দুঃখজনক মৃত্যু সবশেষে বেনী মল্লিক কে হত্যার চেষ্টা দায়ে তার কারাবাস সবই দেশভাগজনিত ট্রাজিক পরিণতি বলে গণ্য করা হয়। এরই মধ্যে জমিদার গৃহে পালিতা মুসলিমকন্যা হাসুবানুর ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাসুবানু চরিত্রের মধ্য দিয়েই দ্বিজাতি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। কুড়ি বছর মীরা ও হাসু একই ঘরে, একই অন্নের অংশীদার-হাসুর এই উক্তিও অবহেলা করার মত নয়। এই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে দেশভাগের জ্বালা বিবৃত হয়েছে। দেশভাগ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের স্বার্থের জন্য সংঘটিত হলেও অখণ্ড ভারতবর্ষের জনগণের পক্ষে বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু দেশভাগ হয়নি। দেশভাগের বলি হয়েছে মানুষ। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। সর্বোপরি ধ্বংস হয়েছে মানবতা বা মানুষের হৃদয়। অগ্নি-সংযোগের ফলে হিন্দু মুসলমানের বাড়ি পোড়েনি, পুড়েছে মানুষের বিশ্বাস, সততা ও নির্ভরতা। প্রাক্তন জমিদার জীবেন্দ্রনারায়ণ রায় যাকে হাসুবানু জ্যাঠামশাই বলে ডাকতো তিনি হাসুকে প্রশ্ন করলেন— "আমার বাড়িতে আগুন দিলে কি এর প্রতিকার হবে মা? হাসু উত্তর করল— "হবে জ্যাঠামশাই, তোমার বাড়িতেই আগুন দেওয়া দরকার। নিরপরাধ আদর্শবাদের অপমৃত্যু ঘটলে তবেই মানুষের বুকের ভেতর টনটন করে ওঠে। ওরা তোমার

বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেখতে চাইলো ওদের বুকের আগুনের ভয়ানক চেহারাটা! ওদের কোন জাত নেই জ্যাঠামশাই— কোন ধর্মের বালাই নেই।"[১৬]

'হাসুবানু' উপন্যাসের পার্শ্বচরিত্র বৃদ্ধ ছায়েদ মাঝি এবং অন্য পার্শ্ব চরিত্র শাখাওয়াৎ গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বেগম খাতুন পাকিস্তান পেয়েও রীতিমতো হতাশ। কারণ শেষ পর্যন্ত দেশভাগ হলো! দেশভাগের সিদ্ধান্ত যে কত মারাত্মক ছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর "India wins freedom" বা "ভারত স্বাধীন হলো" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন - "গান্ধীজী বলেন তাঁর চোখের সামনে দিল্লির মুসলমানদের কোতল করা হচ্ছে। এটা ঘটেছে এমন একটা সময় যখন তাঁর অতি আপন বল্লভভাই প্যাটেল হলেন ভারত সরকারের হোম মেম্বার এবং যখন তাঁরই ওপর রাজধানীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার। মুসলমানদের রক্ষার কাজে তিনি শুধু ব্যর্থই নন, এ ব্যাপারে কারো কোন অভিযোগই তিনি কর্ণপাত করেননি। গান্ধীজি বলেন যে, আর কোন উপায়ান্তর না দেখেই এখন তাঁকে শেষ অস্ত্র অবলম্বন করতে হচ্ছে অর্থাৎ অবস্থা না বদলানো পর্যন্ত তিনি অনশনব্রত গ্রহণ করবেন। সেই মতো তিনি অনশন শুরু করেন।"[১৭]

দেশভাগের পর উদ্বাস্তুরা যে কলোনীগুলি স্থাপন করেন সেগুলি খুব সহজেই হয়নি। জমিদারদের লেঠেল বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়েছিল। বহু রক্ত-ঘামের বিনিময়ে অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনেক কলোনী স্থাপিত হয়েছিল। এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। সেটি হলো দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা উদবাস্তুদের প্রতি খুবই অনুদার ছিল। তারা কোনমতেই উদ্বাস্তুদের মেনে নিতে পারেনি। এই অনুদার নীতির ফলেও কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদারদের লেঠেল বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে সিংহভাগ মানুষই ছিলেন মহিলা। কলোনী-উচ্ছেদ ও তার প্রতিরোধে উদ্বাস্তু মহিলাদের এই রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের এক অতি বিশ্বাসযোগ্য ছবি তুলে ধরেছেন সাবিত্রী রায় তাঁর "স্বরলিপি" উপন্যাসে। যে অঞ্চল ক'বছর আগেও ছিল ধূধূ মাঠ, জঙ্গল, জলজ ও শ্বাপদ জন্তুর বাসভূমি, সেই মাঠের বুকেই গড়ে ওঠে মিলিটারি ক্যাম্প যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন বহন করছে। চাঁদমারি সৈন্যদের ফেলে যাওয়া আসবাবপত্র উচ্ছিষ্ট অন্য অনেক জঞ্জাল সেসব উদ্বাস্তুরা নিজেদের হাতে সাফ-সুতরো করে খানা ডোবা ভরাট করে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছিল। পুরুষ মহিলা কিশোর যুবকরা স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে তৈরি করেছিল নতুন আবাস। সেই সর্বস্বহারা মানুষের ভিটেমাটিটুকুও কেড়ে নিতে এসেছিল পুলিশ ও জমিদারের গুন্ডার দল। তারা এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র তুলসীকে গুলি করে হত্যা করে। তুলসীর বউয়ের সামনেই তারা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, যে ঘরখানা সে তুলেছিল স্বামীর সঙ্গে মাটি টেনে টেনে। উদ্বাস্তুরা বাস্তুহারা হল দ্বিতীয়বার। প্রথমবার পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারের উদ্বাস্তুবিরোধী আচরণে। পুলিশ ও গুন্ডাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেয়েরা মিছিল করে। প্রতিবাদ করলে পুলিশ লাঠি চালায় তাদের ওপর। প্রকাশ্য দিনের আলোয় মেয়েদের এই নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশকে তারা সহ্য করতে পারছে না তাই বিকেলে সভা হয়। বৃদ্ধ ক্ষেত্র মণিকে প্রমিলা জিজ্ঞেস করেন "আপনিও যাইবেন?" ক্ষেত্র মনি উত্তর দেন "যামুনা কও কি?"[১৮]

দেশভাগের সাহিত্য হিসেবে প্রফুল্ল রায়ের ‘দাঙ্গা, দেশভাগ এবং তারপর, ‘মহাকাল পেরিয়ে এসে,’ ‘মহাযুদ্ধের ঘোড়া,’ ‘শতধারা বয়ে যায়’, ‘ক্রান্তিকাল’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাবণ্যময় ভাষায় লেখক অদূর অতীতের পূর্ব বাংলার স্মৃতিমেদুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। "মহাযুদ্ধের ঘোড়া" উপন্যাসে নায়ক অশোক উদ্বাস্তু বস্তির ছেলে। তার চোখে ইন্ডিয়া বা ভারতের স্বাধীনতা কি তার ব্যাখ্যা করেছেন লেখক "এই সেদিনও ইন্ডিয়া ছিল ব্রিটিশকলোনী। মাত্র কয়েক বছর হল দেশটা স্বাধীন হয়েছে। ইংরেজরা যখন ছিল, নিজেদের স্বার্থে বড় বড় ক’টা শহরের চারপাশে কিছু কলকারখানা বসিয়েছিল। জুট ,টেক্সটাইল, ট্যানারি এটসেটেরা ..... কিন্তু সে আর কটা। আমাদের দেশকে শুষে নিয়ে শুকনো খোলস করে ফেলে রেখে ওরা চলে গেল। তার ওপর ইন্ডিয়ার এত পপুলেশন। বেসিক্যালি ইন্ডিয়া এগ্রারিয়ান কান্ট্রি, রাতারাতি তাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডিয়া বানিয়ে ফেলবো তাই কখনো হয়? আমরা উন্নয়নের দিকে সবে পা ফেলতে শুরু করেছি।"[১৯]

দেশভাগের আরেকটি চলমান বর্ণনা পাওয়া যায় তখন রায়চৌধুরীর ‘বাঙালনামায়’ —"দাঙ্গা ভালো মতো শুরু হওয়ার পর মুসলমান পাড়ায় ধুতি অথবা হিন্দুপাড়ায় লুঙ্গি পাজামা পড়ে ঢোকার কথা কেউ আর চিন্তা করতে পারত না। আবাসিকটি এই খবর আনার অল্পক্ষণ পরেই নানা গুজবে হোস্টেলের হাওয়া গরম হয়ে উঠলো। রাজাবাজার, কলুটোলা, পার্ক সার্কাসে নাকি হাজার হাজার হিন্দু খুন হয়েছে। কত হিন্দু মেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই। বাইরে বের হওয়া তখন নিরাপদ ছিল না।"[২০]

বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক হাসান আজিজুল হক তাঁর ‘আগুনপাখিতে’ দেশবিভাগের সমকালীন দাঙ্গা ও হিন্দু-মুসলমানের এই অসহিষ্ণুতা ও নারকীয় হত্যার ঘটনার নিন্দা করেছেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের ছেলে সত্যকে মুসলমানরা হত্যা করে, তেমনই ইউসুফ মিঞার নৃশংস হত্যা কিংবা স্কুলপড়ুয়া মুসলমান বালকটির বীভৎস মৃত্যুর করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে। আবার তথাকথিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম প্রবক্তা মহম্মদ আলি জিন্নার একটি ভাষণও প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন— 'আপনারা স্বাধীন, এই পাকিস্তান রাষ্ট্রে আপনাদের ইচ্ছামত মন্দির মসজিদ অথবা অপর যেকোনো উপাসনাস্থলে যাবার অধিকার আপনাদের আছে। আপনাদের ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় যাই হোক না কেন তার সঙ্গে এই মূলনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা একই রাষ্ট্রের অধিবাসী। আমার মতে এই নীতিকে আমাদের আদর্শরূপে মান্য করা উচিত। তাহলে আপনারা দেখবেন যে কালক্রমে হিন্দুরা আর হিন্দু এবং মুসলমানরা আর মুসলমান থাকবে না। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে নয়, কারণ সেটা হল প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন। এ হলো রাজনৈতিক অর্থে, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে।"[২১]

"আগুনপাখি" উপন্যাসের নায়িকার (নামবিহীন) স্বদেশপ্রীতি আমাদের মুগ্ধ করে। সে আপন স্বামী, আত্মজ ও আত্মজাদের মায়া ত্যাগ করে স্বদেশকেই আপন বলে মেনে নিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, রক্তপাত, হত্যা চাক্ষুষ করা সত্ত্বেও সে দেশত্যাগ করেনি। তার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী সে ব্যক্ত করেছে — "পাকিস্তানের নাম করে জিন্না ইংরেজদের কাজটিকেই করে দিলে, আর ক্ষমতার লোভে পড়ে নেহেরুরাও তাই করলে। প্যাটেল, শ্যামা মুখুজ্যে মুসলমানদের আলাদা করে দিতে চেয়েছিল, তাই হল। গান্ধী এখন একঘরে, দরজায় দরজায় তাকে কেঁদে মরতে হবে।"[২২]

দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু-সংকট নিয়ে বাংলা উপন্যাসের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়- 'দেশবিভাগ নিয়ে কোন সার্থক উপন্যাস লেখা খুবই কঠিন, কেননা তা আর একটি সাম্প্রদায়িক সমস্যা বা দাঙ্গাকে "মোটিভেট" করতে পারে। দেশবিভাগ নিয়ে যদি কোন উপন্যাস লিখতে হয় তবে তা বস্তুনিষ্ঠ হবেনা কেননা তার দায়িত্বটা অন্য একটি সম্প্রদায়ের উপরই এসে পড়ে। কেননা তারাই আলাদা রাষ্ট্র করার দাবি তুলেছিল ও সেই দাবি আদায়ের জন্যই দাঙ্গা হত্যা, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "অর্ধেক জীবন" ও "পূর্ব-পশ্চিম"উপন্যাস দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখা হলেও তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

কথাসাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে"উপন্যাসটিতে দেশভাগজনিত সমস্যার মরমী চিত্র ফুটে উঠেছে। এক যৌথ পূর্ববঙ্গীয় পরিবার দেশভাগজনিত কারণে পশ্চিমবঙ্গে এসে কি অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করেছিল তার সূক্ষ্ম বিবরণ গ্রন্থটিতে বিবৃত হয়েছে। হিন্দু মেয়ে মালতিকে ধর্ষণ করেছিল তার মুসলমান প্রতিবেশীরা। ধর্ষিতা মালতি আশ্রয় পেয়েছিল মুসলমান ফকিরের কাছে। "নদীর জলে প্রতিমা বিসর্জন দিলে, দশহাত দুগ্গা ঠাকুর যেমন চিৎ হয়ে থাকে তেমনি মালতি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। নাভির নীচটা কারা সারারাত খাবলে খুবলে খেয়েছে।"[২৩]

দেশবিভাগের সঙ্গে জড়িত নারকীয় অত্যাচার ও নারীদের উপর হিংস্র আক্রমণ আমাদের কল্পনাশক্তিকে অসার করে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য-সমালোচক অশ্রু কুমার সিকদার "ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য"শীর্ষক গ্রন্থে জানিয়েছেন "নোয়াখালীর নামজাদা উকিল রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর পরিবারের সমস্ত পুরুষকেই হত্যা করা হয়। পুরুষদের হত্যা করে ঐ পরিবারের বিবাহিতা, বিধবা ও অবিবাহিত নারীদের ধর্ষণ করা হয়।"[২৪]

নোয়াখালীর দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চলে গান্ধীজী প্রথমে গোপেয়ার বাগ গ্রামটি পরিদর্শন করেন। সেখানে ঘন ঝোঁপের মধ্যে অনেক মানুষের মৃতদেহ মাটিতে পোঁতা ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে এই অঞ্চলটি ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেখানে হিন্দু পরিবারের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু গ্রামটির চারপাশে চারগুণ বেশি ছিল মুসলমানদের অবস্থান। একটি ছিল পটোয়ারীদের বাড়ি। তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকার কম হবে না। তাঁরা যথেষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বাড়ির চারপাশে ছিল সুন্দর বাগান। কিন্তু তখন সর্বত্র ছিল রক্তের সমুদ্র। বাড়ির মোট ২৩ জনকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। উঠোনের কোণে স্তূপীকৃত হয়ে মৃতদেহ পড়েছিল। কাউকেই রেহাই দেওয়া হয়নি। অনেককে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দরজার সর্বত্র ছিল রক্তের চিহ্ন। বাতাসে ভাসতে থাকে পুঁতি গন্ধ। এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ডে যারা যুক্ত ছিল তারা এই বাড়িরই প্রতিবেশী। একজনের নাম কাশেম আলি। কাশেম একসময় রয়াল এয়ার ফোর্সের সদস্য ছিল। গান্ধীজী ওখানে পৌছাঁবার পর থেকেই সে আত্মগোপন করে ছিল।[২৫]

এইসব প্রতিবেদন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা ও নারকীয় পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের ঘৃণা উৎপন্ন করে। দেশবিভাগোত্তর যুগের একজন স্বনামধন্য সাহিত্যিক হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর একাধিক উপন্যাসে দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তুজীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর "সীমান্ত" গল্পের একটি অনুচ্ছেদ এইরকম

—"নদীর ওপার থেকে ঝাঁক বেঁধে বেঁধে আসতে লাগলো মুসলমান, এপার থেকে দল বেঁধে পালাতে লাগল হিন্দুরা। বোঝা গেল রাতারাতি পাল্টে গেছে দুনিয়ার হালচাল। কিন্তু মনে মনে কিছুতেই একটা জিনিসের ফয়সালা করতে পারল না ফজলে রাব্বি। আজাদীর জন্য যে মাটিতে দয়াল মন্ডল তার বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে-দিলে সেই মাটিই তার রইল না। সে হল ভিনদেশের বাসিন্দা।"[২৬]

সাম্যবাদে বিশ্বাসী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ডাক" ছোটগল্পে শরণার্থীদের দলে দলে চলে আসার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়-"পালাচ্ছিলাম আমরা রাতের আধাঁরে দুরন্ত তুফানে, পোড়া গ্রাম, ধ্বসাভিটা আর জংলা পথের বুক দিয়ে আহত হরিণীর মতো সতর্ক, দ্রুত ব্যগ্রতায় আমরা পালাচ্ছিলাম। হরিয়ালপুর, পলাশডাঙ্গা, আমিনগঞ্জ, শিবসাগর, তারপর বুঝি আমাদের স্বপ্নাশ্রিত দেশ।"[২৭]

তাঁর "আগামী" উপন্যাসে দেশত্যাগের যন্ত্রণা পরিস্ফুটিত করেছেন অতি করুণ ভাবে। এই উপন্যাসের নায়ক নিবারণ মুক্তারের স্মরণীয় উক্তিটি ভোলা যায় না— "পাততাড়ি গুটাও অর্জুন, সময় থাকতে সাবধান হওনা কি? ইংরাজ দ্যাশ ছাইরা যাইবো, যাওনের আগে সব নাকি দু'ভাগ কইরা দিব। আমাগো পূর্ববঙ্গ পড়বো মুসলমানের কবলে, আর পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুগো হাতে।এহেন মুসলমান তো এই দেশের নবাব অইল, তারগো হাতেই তো সব। আর বলে এট্টা হিন্দুরেও আস্তা রাখবো না। হয় গরু খাওয়াইয়া জাইত লইব, মাইয়াগুলারে নেয়ে হারেমে ঢুকাইব, নয় গিয়া বরিশালের মত হক্কলেরে কচুকাটা কইরা ছাড়বো। গরু কাইটা হাত অগে পাইকা গ্যাসে, মানুষ কাইটতেও বিরক্ত হয়না এট্টু।"[২৮]

দেশভাগ ও পরবর্তী উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন নারায়ণ সান্যাল। তাঁর "বল্মীক", "এক বৃন্তে দুটি কাঁটা," "হিন্দু না ওরা মুসলিম", "অরণ্য দন্ডক" অন্যতম। "বল্মীক" উপন্যাসের একটি অংশ উল্লেখ করছি— "দর্শনা থেকে বানপুর। দলে দলে চলেছে মানুষ আর মানুষ। অতীত ইতিহাসের যুগে যেমন করে এসেছিল সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে এদের অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষ খাইবার পাশ দিয়ে আর্যাবর্তে নরনারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মৃতবৎসা নারী, সন্তান ক্রোড়ে সদ্য জননী। সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে খাঁচার পোষা পাখি, গলায় চেন কুকুর, ক্যানেস্তারা, পোটলা, বাক্স, বিছানা, মাদুর আর কালি পড়া লন্ঠন। কোলে শিশু, চোখে আতঙ্ক আর অন্তরে সন্ত্রাস। ওদের পূর্বপুরুষ আর্যাবর্তে এসেছিল নতুন দেশ জয় করতে, অনার্যদের উদ্বাস্তু করতে, এরা এলো নিজের দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে।"[২৯]

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক সমরেশ বসুর ‘সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা’, ‘আদাব’ প্রভৃতি লেখায় দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের দুঃসহ জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। "আদাব" গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। দাঙ্গাবিধ্বস্ত একটি রাতে এক মুসলমান মাঝি ও এক হিন্দু সূতাকল মজুর, নিম্নবর্গীয় দুজন মানুষের বাঁচার জন্য মরিয়া প্রচেষ্টা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আন্তরিকতা, পরে সাময়িক বন্ধুত্ব ও শেষে আদাব জানিয়ে বিদায় গ্রহণ সবই একটি নতুন মাত্রা এনে দেয়। রাতের অন্ধকারে পুলিশের গুলিতে মাঝির মৃত্যু ঘটে। ঈদের দিনে পরিবারের কাছে তার আর পৌঁছানো হলো না। এই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জ্ঞানের অভাব নেই— "হেইসব আমি বোঝি না। মারামারি কইরা হইবা ডাকি আমাগো দুগা লোক মরব, তোমাগো দুগা লোক মরবো। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইবো। সূতামজুরও তাকে সমর্থন করে বলে— "আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কি? এই কলাডা — হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখায় সে—তুমি মরবা, আমি মরুম আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইবো। এই গেল সনের "রায়টে" আমার ভগ্নিপতিকে কাই-ই-টা চাইর টুকরা কইরা মারলো। ফলে হইল বিধবা বইন

আর পোলামাইয়ারা আইয়া পড়লো আমার ঘাড়ের উপর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা এই সাততালার উপর পায়ের পা দিয়া হুকুম জারি কইরা বইয়া রইল আর হালার পো মরতে আমরাই মরলাম।"[৩০]

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক' গ্রন্থে উদ্বাস্তু জীবনের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্বাস্তুদের বর্ণনাতীত কষ্টকর জীবন, স্বার্থপরতা আবার একই সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরতা অত্যন্ত দরদের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে – "মল্লিক বাড়িতে পাকিস্তানী পতাকা ওড়ানো হয়েছিল। অবশ্য খুবই অনিচ্ছা ও ভয়ের সঙ্গে। কয়েকটি মুসলমান যুবক বারবার হানা দিয়ে দেখে যাচ্ছিল পতাকাটি নামিয়ে ফেলা হয়েছে কিনা, শোনা যায় সর্বেশ্বর স্ত্রীকে বোরখা পরিয়ে নিজে লুঙ্গি ও ফেস টুপি পড়ে কলকাতা যাত্রা করেন। পথে দাঙ্গাপ্রবণ কিছু এলাকায় পা দিয়ে বেশ পরিবর্তন করে নেন।"[৩১]

তাঁর 'ফেরা' উপন্যাসটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত ও নারীত্বের চরম অপমানের সাক্ষ্য দেয়। "তখন সদ্য দেশভাগ হয়েছে। পশ্চিমবাংলা, আসাম জুড়ে পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ। আমরা ভলান্টিয়ার হয়ে খাটি, আশ্রয় শিবিরে গিয়ে শরণার্থীদের তদারক করি। লেখাপড়া চুলোয় যাচ্ছে। মনে পড়ে, বীথি নামে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম-ধর্ষিতা। জলকাদার মধ্যে অতি নড়বড়ে বাঁশের ঘরে যেসব অসুবিধার মধ্যে উদ্বাস্তুরা থাকতো, তার মধ্যেই সে ছিল। একদিন সে লজ্জায় আমাকে ডেকে গোপনে জিজ্ঞেস করেছিল —এখানে খারাপ মেয়েছেলেরা কোথায় থাকে। আমার বয়স তখন কম, একটি যুবতী মেয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিলাম— তা দিয়ে কী হবে? মেয়েটা অদ্ভুতভাবে হেসে বলল এদের সঙ্গে থাকা ভালো দেখায় না। আমি তো নষ্ট হয়ে গেছি, খারাপ মেয়েদের সঙ্গে থাকা ভালো"।[৩২] দেশভাগের কি নির্মম পরিহাস !

সম্প্রতি দেশভাগ ও উদ্বাস্তুজীবন নিয়ে বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত "দেশভাগ স্মৃতি আর স্তব্ধতা," 'বাংলা পার্টিশন কথা', 'উত্তর প্রজন্মের খোঁজ' (মনন কুমার মন্ডল), নীলেন্দু সেনগুপ্তর 'দেশভাগ ও ছিন্নমূল মানব', শঙ্কু মহারাজের 'দেশের মাটি', সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের 'দেশভাগে হারিয়েছি যাদের', আনন্দ গোপাল ঘোষের 'স্বাধীনতার তিনকুড়ি পনেরো', মন্টু মিত্রর 'নোয়াইপারের কথকতা', ইন্দুবরণ গাঙ্গুলীর 'কলনী স্মৃতি', শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনী', মণিকুন্তলা সেনের 'সেদিনের কথা', তুষার সিংহের 'মরণজয়ী সংগ্রামে বাস্তুহারা', প্রিয়রঞ্জন দাশগুপ্তের 'উপনিবেশ', দক্ষিণা রঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম', সুজন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম' প্রভৃতি গ্রন্থে ফেলে আসা গ্রাম শহরের বেদনাবিধুর স্মৃতিচিত্রণ বিবৃত হয়েছে। সাহিত্যের বিচারে তার মূল্য নেহাত কম নয়!

উপন্যাস, ছোটগল্প ও স্মৃতিচিত্রনের পর কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর বিখ্যাত ছড়ায় দেশভাগের বেদনা-মিশ্রিত ব্যঙ্গ করেছেন। "তেলের শিশি ভাঙ্গলে পরে, খুকুর পরে রাগ করো,/ তোমরা যে সব বুড়ো খোকা, ভারত ভেঙে ভাগ করো, তার বেলা?" বাংলাদেশের কবি শামসুর রহমানের কবিতায় স্বাধীনতা শব্দের অর্থ এরূপ —"স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অমর কবিতা, অবিনাশী গান স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুল" ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।"[৩৩] তবে দেশভাগ ও স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক ও উদ্বাস্তুদের প্রতি ব্রিটিশ শাসক ও তথাকথিত উন্নতিশীল কেমন ব্যঙ্গার্থক মন্তব্য করেছিল সে সম্বন্ধে জয় গোস্বামী একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। সেই বেদনাক্লিষ্ট মর্মান্তিক ভাষা ও ভাব পাঠকের মনকে আবেগতাড়িত করে।

"আমরা যেদিন আগুনের নদী থেকে
তুলে আনলাম, মার ভেসে যাওয়া দেহ,
সারা গা জ্বলছে, বোন, তোর মনে আছে

প্রতিবেশীদের চোখে ছিল সন্দেহ

দীর্ঘ চঞ্চু রোঁয়া ওঠা ঘাড় তুলে

এগিয়ে এসেছে অভিজ্ঞ মোড়লেরা

বলছে,—'এ সভা বিধান দিচ্ছে শোন

দাহ করবার অধিকারী নয় এরা'।

সেই রাত্রেই পালিয়েছি গ্রাম ছেড়ে

কাঁধে মার দেহ, উপরে জ্বলছে চাঁদ

পথে পড়েছিল বিষাক্ত জলাভূমি

পথে পড়েছিল চুন লবণের খাদ।

যে দেশে এলাম মরা গাছ চারিদিকে

ডাল থেকে ঝোলে মৃত পশুদের ছাল

পৃথিবীর শেষ নদীর কিনারে এসে

নামিয়েছি আজ জননীর কঙ্কাল।

বোন তোকে বলি এ অস্থি পোড়াবো না

গাছের কোটরে রেখে যাব এই হাড়

আমরা শিখিনি, পরে যারা আছে তারা

তারা শিখবে না এর সঠিক ব্যবহার ?

পূবদিকে সাদা করোটি রঙের আলো,

পিছনে নামছে সন্ধ্যার মত ঘোর

পৃথিবীর শেষ শ্মশানের মাঝখানে

বসে আছি শুধু দুই মৃতদেহ চোর।।"[৩৪]

দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখা নাটকের সংখ্যাও অপ্রতুল নয়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’ নাটকে যুগচেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত যুগোত্তীর্ণ শিল্পরচনায় তাঁর মনন ও ভাবনা নিবিষ্ট হয়ে আছে। তাঁর এই একাঙ্ক নাটকের মধ্যে দেখা যায় যে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত হিন্দুরা দাঙ্গা ও আনুষঙ্গিক আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। স্থানীয় মুসলিম নেতা সোন্না মোল্লা চায় যে হিন্দুরা গ্রামে থাকুক। তাদের ‘হিন্দুস্তানে’ যাবার দরকার নেই। অথচ অন্য এক মুসলিম নেতা ইয়াসিন গ্রামে দাঙ্গা বাঁধায়। এই নাট্যকারের অন্য একটি নাটক ‘নয়া শিবির’- এ বিড়ম্বিত উদ্বাস্তুদের জীবনের কঠোর সংগ্রামী চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্য এক সংগ্রামী ও ব্যতিক্রমী নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর ‘বাংলার মাটি’, ‘ছেঁড়া তার, ‘পথিক’ নাটকে দেখা যায় যে দেশভাগের ফলে হিন্দুরা দলে দলে চলে আসছেন ভারত বা ইন্ডিয়ায়। তাদের সেই দুর্বিষহ স্বদেশ যাত্রা বেদনাবিদ্ধ ও মর্মান্তিক। নাট্যকার সলিল সেনের সাড়া জাগানো ‘নতুন ইহুদি’ নাটকে দেখাতে চেয়েছেন যে এই দেশভাগ বা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ফলে উদ্বাস্তু বা নতুন এক ইহুদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। এই নাটকের মুখ্য চরিত্র পন্ডিত মনোমোহন ভট্টাচার্য সপরিবারে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন ও এখানেও তিনি অপরিসীম দুর্গতির শিকার হয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্যের "গোত্রান্তর", ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্তর "দিনান্তের আগুন", ঋত্বিক ঘটকের ‘দলিল’ প্রভৃতি নাটক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনকে নিয়ে লেখা। সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিভিন্ন দিক মুহূর্ত হয়ে উঠল, একইসঙ্গে অন্তরের আবেগ দিয়ে সমাজ সংসারের বাস্তবতাকে মঞ্চে প্রতিফলিত করলেন এইসব নাট্যকারেরা। বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ দিয়ে যে আধুনিক নবনাট্য

আন্দোলনের শুরু, খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন, সহায়সম্পদশূন্য প্রাণের স্পন্দনে সেই ধারার নাটক প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেল বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে।

স্বাধীনতা ও দেশভাগ পর্বে চলচ্চিত্র বা সিনেমার উপর প্রভাবও কম নয়। বাংলা চলচ্চিত্রে উদ্বাস্তুজীবন ও তার যন্ত্রণা চিত্রায়িত করে যিনি এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি হলেন ঋত্বিক ঘটক। দেশভাগের বেদনাবহ ঘটনা ও সংঘাত নিয়ে তিনি যখনই কোন নাটক রচনা করেছেন অবধারিতভাবেই তার চলচ্চিত্রে বা চিত্রনাট্যে দেশভাগ ও উদ্বাস্তুজীবনের কঠোর সংগ্রাম ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর ‘দলিল’ নাটক শুধু বাস্তুহারা জীবনের প্রতিচ্ছবি বা দলিল নয়, উদ্বাস্তু মানুষ একটু আশ্রয়ের জন্য, একটু খাবারের জন্য, ভালোভাবে বাঁচার জন্য কি অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছে! পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু মানুষেরা যে আশ্রয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল, সেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর কি নিদারুণ অবহেলা, অনাদর ও অত্যাচার তারা ভোগ করে। তৎকালীন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে বউবাজার স্ট্রিটে মহিলাদের মৌন প্রতিবাদী মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। প্রাণ দিয়েছিলেন লতিকা, প্রতিভা ও অমিয়া। এই বীভৎস দৃশ্য ছিন্নমূল মানুষের শেষ পরিণতির চিত্র নয় বরং সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিহ্নও বটে! ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের কাঠিন্য ও বাস্তবতা তিনি মুর্ত করেছেন তাঁর "মেঘে ঢাকা তারা", "সুবর্ণরেখা", "কোমল গান্ধার" প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’, সলিল সেনের ‘নতুন ইহুদি’ প্রভৃতিতে উদ্বাস্তুজীবনের দুঃসহ প্রতিছবি পাওয়া যায়। হিন্দি ফিল্মে ‘গরম হাওয়া’, ‘তমস’, ‘গদর-এক প্রেম কথাতেও’ দেশভাগ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

সাহিত্য সংস্কৃতি ছাড়া দেশভাগ কয়েকটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আভাস দেয়। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত নিকটবর্তী স্থানে জনবিন্যাস ও অর্থনীতির ওপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পেশার উত্তরণ ঘটে, শিক্ষিতা

মহিলারা অফিসে কাজে যোগ দেন, বিভিন্ন স্থানে অধিক পরিমাণে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে রিফিউজি, ক্যাম্প, হোম, হকার, টোল, পার্টিশন, পাসপোর্ট প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। কর্ম জগতে এত বিপুল সংখ্যায় মেয়েদের প্রবেশ এর আগে ঘটেনি। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু মেয়েরা অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। আবার সামাজিক জীবনে আচার বিচার ও পারিবারিক জীবনের অনেক বিধিনিষেধও বর্জিত হয়। দেশভাগের দাঙ্গায় হিন্দু নারীদের যে লাঞ্ছনা, ধর্মান্তর ও নিগ্রহ ঘটে, আধুনিকতার সফল বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে বঙ্গনারীর পক্ষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়। এই নতুন রূপ নিঃসন্দেহে আগামী প্রজন্মের দিশারী।

গ্রন্থসূত্র-

১) চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, পৃ. সংখ্যা - ভূমিকা

২) রায়, নিশিথ রঞ্জন, পৃষ্ঠা ৩০-৩৬

৩) সুর ,অতুল, পৃষ্ঠা ১৮

৪) ত্রিপাঠী ,অমলেশ, পৃষ্ঠ ১৫

৫) ত্রিপাঠী , অমলেশ, পৃষ্ঠা ৫৫

৬) শাসমল ,বিমলানন্দ, পৃষ্ঠা ৩৭

৭) বসু, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৮৬

৮) চট্টোপাধ্যায়,ভবানীপ্রসাদ, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭

৯) সুর, নিখিল, পৃষ্ঠা ৪৭৫ -৪৭৬

১০) ঘোষ দস্তিদার, শুভাদিত্য, পৃষ্ঠা ১

১১) মন্ডল,মনণ কুমার, পৃষ্ঠা ৩১

১২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পৃষ্ঠা ২৭

১৩) মিত্র, অমর, পৃষ্ঠা ২৩

১৪) সান্যাল, প্রবোধকুমার, পৃষ্ঠা ৪

১৫) স্বদেশী, মুজিব, পৃষ্ঠা ১৬৭-১৭০

১৬) সান্যাল, প্রবোধকুমার, পৃষ্ঠা ৪৯

১৭) আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম, পৃষ্ঠা ২১৬

১৮) সুর, নিখিল, পৃষ্ঠা ৩৪২-৩৪৮

১৯) রায়, প্রফুল্ল, পৃষ্ঠা ৩৯৪

২০) রায়চৌধুরী, তপন কুমার,পৃষ্ঠা ১৫২

২১) বন্দ্যোপাধ্যায়,শৈলেন কুমার, পৃষ্ঠা ২-৩

২২) হক, আজিজুল হাসান, পৃষ্ঠা ২৩১

২৩) বন্দ্যোপাধ্যায়,অতীন, পৃষ্ঠা ২৬৮

২৪) শিকদার, অশ্রু কুমার, পৃষ্ঠা ৫৪

২৫) সিনহা, দাশগুপ্ত, চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৬৮

২৬) গঙ্গোপাধ্যায়,নারায়ণ, পৃষ্ঠা ৪৭

২৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৬২

২৮) বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, পৃষ্ঠা ৫৪

২৯) সান্যাল, নারায়ণ, পৃষ্ঠা ১-৩

৩০) বসু ,সমরেশ, পৃষ্ঠা ৭২

৩১) মুখোপাধ্যায় ,শীর্ষেন্দু, পৃষ্ঠা ২৮-২৯

৩২) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, পৃষ্ঠা ১৩২-৩৩

৩৩) রহমান ,শামসুর, পৃষ্ঠা ১৬

৩৪) গোস্বামী, জয়, পৃষ্ঠা ৬২

গ্রন্থপঞ্জী

১) চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ। *দেশ বিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী*/ কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. সংখ্যা ভূমিকা, ১৯৯৩।

২) রায়, নিশিথ রঞ্জন। *ইতিহাসে ভারতবর্ষ*/ কলকাতা। এ্যালায়েড বুক এজেন্সি, ১৯৭৪।

৩) সুর ,অতুল। *বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন*/ কলকাতা ,সাহিত্য লোক,২০০১।

৪) ত্রিপাঠী, অমলেশ। *স্বাধীনতার মুখ*/ কলকাতা ,আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

৫) ত্রিপাঠী, অমলেশ। *ভারতের মুক্তি সংগ্রামের চরমপন্থী পর্ব*/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬।

৬) শাসমল, বিমলানন্দ । *ভারত কি করে ভাগ হলো*/ কলকাতা, হিন্দুস্থান বুক সার্ভিস, ১৯৯৭।

৭) বসু, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ। *আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে*/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৪।

৮) সুর, নিখিল। *স্বাধীনতা, দেশভাগ, বঙ্গনারী*/ দেশ শারদীয়া সংখ্যা, ১৪৩০, কলকাতা, ২০২৩।

৯) ঘোষ দস্তিদার, শুভাদিত্য। *দেশ বদলের যন্ত্রণা* / কলকাতা, বর্তমান রবিবার পত্রিকা, ২০২৩ ১৩ই আগস্ট।

১০) মন্ডল ,মনণ কুমার। *বাংলা পার্টিশন কথা*/ কলকাতা, দে'জ পাবলিশার্স, ২০২৩।

১১) বন্দ্যোপাধ্যায় ,শেখর। *শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনী ১৯৪৭-১৯৭৭*/ কলকাতা, আলফাবেট বুকস, ২০২৩।

১২) মিত্র ,অমর । *রেডক্লিফ লাইন*/ কলকাতা, দে'জ পাবলিশার্স, ২০২৩।

১৩) স্বদেশী, মুজিব। *বাংলা সাহিত্যে বঙ্গভঙ্গ ও দেশভাগ*/ সোপান পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৫।

১৪) সান্যাল, প্রবোধকুমার। *হাসুবানু*/ কলকাতা বইমেলা, পুষ্প পাবলিশার্স, ২০০৭।

১৫) আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম। *ভারত স্বাধীন হলো*/ ওরিয়েন্ট লংম্যান ,অনুবাদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৯।

১৬) সুর, নিখিল। স্বাধীনতা, দেশভাগ, ও বঙ্গনারী। দেশ শারদীয়া ,স্বরলিপি সাবিত্রী রায় ১৯৫২,কলকাতা, ২০২৩।

১৭) রায়, প্রফুল্ল। *মহাযুদ্ধের ঘোড়া*/ বর্তমান শারদীয়া সংখ্যা ,কলকাতা, ১৪২৫।

১৮) রায়চৌধুরী, তপন কুমার। *বাঙালানামা*/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮।

১৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন কুমার। *জিন্না, পাকিস্তান, নতুন ভাবনা*/ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৬।

২০) হক, আজিজুল হাসান। আগুনপাখি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মে ২০০৮।

২১) বন্দ্যোপাধ্যায় ,অতীন। *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে*/ অখন্ড সংস্করণ ,করুনা প্রকাশনী, কলকাতা,২০০৮।

২২) শিকদার, অশ্রু কুমার। *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য*/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।

২৩) সিনহা, দাশগুপ্ত , চৌধুরী। *কলকাতা গণহত্যা ও নোয়াখালী গণহত্যা*/ সূত্র- সাতচল্লিশ এর ডায়েরী ,নির্মল কুমার বসু , তুহিনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯।

২৪) গঙ্গোপাধ্যায় , নারায়ণ। *৫০ টি গল্প*/ করুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২১।

২৫) বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ। *গল্প সমগ্র*/ একুশ শতক, কলকাতা, ২০২৩।

২৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ। *উপন্যাস সমগ্র*/ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৩।

২৭) সান্যাল, নারায়ণ। *'বল্মীক' (দশটি উপন্যাস)*/ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০২৩।

২৮) বসু, সমরেশ। *আদাব (সমরেশ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প)*/ কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, ২০২১।

২৯) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। *মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক(শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সেরা* গল্প)। দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০২২।

৩০) মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু। *ফেরা (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সেরা ৬টি উপন্যাস)*/ দীপ প্রকাশন, ২০২২।

৩১) রহমান, শামসুর। *শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*/ সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯।

৩২) গোস্বামী, জয়। *সৎকার গাথা*/ দেশ সাপ্তাহিক জুন, কলকাতা, ১৯৯৫।